লিখবো না ভেবেছিলাম

সব্যসাচী সরকার
ভুতপূর্ব অধ্যাপক, আই. আই. টি., কানপুর,
অবৈতনিক অধ্যাপক, আই. আই. ঈ. এস. টি., শিবপুর।

কয়েক বছর ধরেই ঘটনাগুলি ভাবছিলাম, কিন্তু সময় পাইনি বিষয়টা স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ নিয়ে ব্যাখ্যা করতে। এর মধ্যে অনেক নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে। আমি বোঝাতে চাইছি ইনটেল্কচুয়াল প্রপার্টি রাইট বিষয়ে এখন এমন সব আইন হয়েছে, যা চূড়ান্তভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে এক ভাল স্বপ্ন এখন পেটেন্ট করা যায়। তাই ভাবলাম আমার পুরোনো গবেষণা প্রবন্ধগুলি একটু খুঁটিয়ে দেখলে কিছু তথ্য এ বিষয়ে পাওয়া যেতে পারে, যা হয়তো সেই রকম স্বপ্নের মূল হতে পারে। আজ রবিবার এরকম এক ভাবনা নিয়ে দিন আরম্ভ করার কথা ভেবে আজকের বর্তমান পত্রিকার রবিবারের পাতায় চোখ দিতেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বেদনা ও যন্ত্রণার কাহিনিগুলি পড়ে আমার সিস্টার নিবেদিতার একটা কথা মনে পড়ে গেলো— তিনি আচার্যকে তাঁর যেসব গবেষণা প্রবন্ধগুলি চক্রান্তের জন্য পাবলিশ হয়নি, তা বই-এর আকারে পাবলিশ করতে অনুরোধ করেন। জড়ের কি প্রাণ আছে-গাছপালা, ধাতু বা পাথরের মত যৌগ পদার্থ কি জীবন্ত জীবের মত নড়াচড়া করতে পারে— তাঁর বইয়ের এই তথ্যগুলি কোন জার্নালের বিদ্বেষপূর্ণ রিভুয়ের জন্য না ছাপা হয়ে থাকেনি। তাই আজ গাছপালার প্রাণ আছে আমরা তা জানি আর ধাতু বা পাথর সম-যৌগ-অণুবিশিষ্ট পদার্থগুলির স্মার্ট গুণগুলি প্রায় জীবন্ত প্রাণীর বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহারের সমান সেটাও বুঝতে পারছি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে এ বিষয়গুলির আবিষ্কারক এটা বিশ্ব আজ স্বীকার করে। সিস্টার নিবেদিতা যা বলেছিলেন সেটা বহু বছর পরে আমেরিকার বিখ্যাত জার্নাল, সায়েন্সের এডিটর, ''ইনডিউসড্ ফিট থিওরী'' খ্যাত অধ্যাপক খোসল্যাণ্ড এক সম্পাদকীয় লিখেছিলেন যে অনেক যুগান্তকারী গবেষণা তাঁরা পাবলিশ করতে পারেন না। কি কারণে এডিটর হিসাবে তারা সেটা পারেন না সেই বাধ্যতামূলক কারণগুলি লেখা যাবে না বলে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ঐরকম যুগান্তকারী গবেষণা বইয়ের আকারে প্রকাশিত করা বুদ্ধিমানের কাজ। নিউটন এটা হয়তো আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর উপলব্ধিগুলি তিনি প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা নামে এক বইয়ের আকারে প্রকাশ করেন। পরাধীন ভারতে এরকম প্রবন্ধের বিদ্বেষপূর্ণ রিভুয়ের আরো ঘটনা আছে। বিলেতের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন সত্যেন বোসের প্রবন্ধ না ছেপে ফেরত দিয়েছিলো। তিনি পেপারটা আইনস্টাইনকে পাঠালেন ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনের ফেরতের কারণ জানতে। পরিষ্কার লিখলেন যে, যদি কিছু ভুল থাকে তা একটু দেখে দিতে। উত্তরে আইনস্টাইন ক্ষমা চেয়ে লিখেছিলেন যে প্রবন্ধে কোনো ভুল না থাকায় তিনি সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সত্যেন বোসকে না জানিয়ে এক জার্মান পত্রিকা, যাতে তিনি নিজের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করেন, সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই পত্রিকার এডিটর এই প্রবন্ধটি পেলেন, যেটি আইনস্টাইন রিভুয়ু করে প্রকাশিত করার জন্য নিবেদন করেছেন। ওই প্রবন্ধ এক নতুন যুগের সূচক হিসেবে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন সে বিষয়ে আরো কিছু তথ্য সংযোজন করে সত্যেন বোসের সঙ্গে আরো নতুন প্রবন্ধ প্রকাশিত করাতে সমষ্টিগত সেই গবেষণার ফল হিসেবে সৃষ্টির অনেক মূল কণার নাম ''বোসন'' হিসেবে গুরুত্ব পেলো। এই বিশ্বে ভগবানের সৃষ্টির প্রথম কণারও জাতগোত্র

এই নামেই স্বীকৃতি পেলো। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসের এই ঘটনার পরে প্রফেসর রমনকে সাহায্য করেন প্রফেসর মেঘনাদ সাহা। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধটিকে শীঘ্রতার সঙ্গে প্রকাশিত করার জন্য শুধুমাত্র তাঁর গবেষণা প্রবন্ধটিকে নিয়ে ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সের এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। কয়েক পাতার নিবন্ধ এক বইয়ের আকারে প্রকাশ করা যায় না, তবে এডিটরের সঠিক মূল্যায়নে প্রবন্ধ সহজেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ সবই ইনটেল্কচুয়াল প্রপার্টি রাইটের অন্তর্গত, তবে আবিষ্কারের ফলে যদি কোনো বিশেষ কার্যে তা ব্যবহার করে প্রভুত ধন উপার্জনের দরজা খুলে যায়, সেটা গবেষণা প্রবন্ধটির রচয়িতার উপরি পাওনা। এটা করতে গেলে পেটেন্ট করতে হয়। যে বিশ্ব পরিচিত নামগুলির বর্ণন আমি এখনো পর্যন্ত করেছি তাঁরা কেউ পেটেন্ট-এ আস্থা রাখেননি। তাঁরা সবাই সরস্বতীর বরপুত্র, নিজেদের আবিষ্কারগুলি বাক্সবন্দী করে মোটা টাকার পরিবর্তে সেগুলি বেচার চেষ্টা তাঁরা করেননি। এখন অবশ্য আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমরা অনেক পরিবর্তিত মেজাজের লোক। অন্যের গবেষণা স্বীকৃতি না দিয়ে বরং কাজ চুরি করে নিচ্ছি। এবারে নিজের একটা খারাপ অনুভূতির কথা লিখে এই লেখা শেষ করছি। যদিও আমার এই গবেষণা মেদিনী কাঁপানো কাজের মধ্যে পড়ে না, তবুও কাজটা ২০০৫-এ পদার্থবিদ্যার এক জার্নালে প্রকাশিত করেছিলাম, যখন নেচার পত্রিকা এটি না ছেপে ফেরত দিয়েছিলো। এই কাজটির বিশিষ্টতার মাপদণ্ডে দিল্লীস্থিত কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় সেই বিষয়ে আমার ইন্টারভিউ প্রকাশিত হয়েছিলো যা এখনো সার্চ ইঞ্জিনে খোঁজ করলে কম্প্যুটারে পাওয়া যাবে। ডিএসটি প্রযোজিত এক ইউ-টিউবে আবিষ্কারটির ডকুমেশটেশান আজতও আছে। জিনিসটি তেল পুড়িয়ে কাজল তৈরীর কাহিনি, কিন্তু তার মধ্যে ন্যানো মাপের কার্বন আছে, সেটাই আবিষ্কার। ২০০৭-এ এক আমেরিকান মোমবাতি পুড়িয়ে ন্যানো মাপের কার্বন তাতে খুঁজে পেলো। তার কাজ আমার কাজ থেকে দু-বছর পরে প্রকাশিত, তাই আমি তাকে লিখেছিলাম যে, এটা তো আমি আগেই দেখিয়েছি। উত্তরে তিনি আমার পেপারটা করতে মিস করেছেন বলে কথা দিয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে আর তিনি কিছু লিখবেন না। এরপর দুটি মজার কথা— প্রথমত বিখ্যাত নেচার পত্রিকাতে অ্যামেরিকান-এর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে হাইলাইট করা হলো। এই সময় আমি সম্পাদক মহাশয়কে লিখেছিলাম যে এই কাজটাই আমি আপনাদের পত্রিকাতে প্রকাশনের জন্য ২০০৪ সালে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সেটা আপনারা ছাপেননি। কারণ লিখেছিলেন যে কাজটা সেরকম নয়। আর আজ তিন বছর পরে আপনারা ঠিক ওই রকম কাজকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। আপনাদের আর্কাইভে দেখুন যে আমার পেপারের ম্যানাসক্রিপ্ট রাখা আছে। সম্পাদক মহাশয় এর জবাব আজও পাঠান নি। এবার দ্বিতীয় আক্ষেপ — দুটি আই. আই. টি. ও একটি আরও পুরানো বেশ নামী কেন্দ্রীয় গবেষণাগার থেকে তেল পুড়িয়ে তিনটি পেপার ছাপা হয়েছিল ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২-তে, ঐ ন্যানো কার্বন তৈরীর কথা। এরা সবাই বঙ্গসন্তান আর এরা আমেরিকানটির কাজের বিষয়টি তাদের লেখায় উল্লেখ করেন, তবে আমার ২০০৫-এর কাজটির কোনো উল্লেখ নেই। ইন্টারনেট পুরনো ডেটা মুছে ফেলতে পারে না, তাই কাজল, ন্যানোকার্বন আর আমার নাম দিলেই গুগল সব তথ্য উগরে দেবে ইনটেল্কচুয়াল প্রপার্টি রাইটের সাক্ষী হিসেবে। অতঃ কিম্।